প্রবন্ধ

স্বাধীনতা ও বাংলাদেশের গণমানুষ

রাহমান চৌধুরী

বিশ্বের মানচিত্রের একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ। গত ষাট বছরে এই ভূখন্ডটি দু-দুবার স্বাধীনতা লাভ করেছে। এই ভূখন্ডের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করেছে একবার মুসলমান হিসাবে আর একবার বাঙালী হিসাবে। স্বাধীনতা লাভ করেছে একবার বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর পরেরবার উর্দুভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা লাভকে অনেকেই মনে করে থাকেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এখন নানাভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী মনে করতেন 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা' সকল কিছুর উর্ধ্বে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তারা ধর্মগ্রন্থের মতো পূজনীয় ব্যাপার বলে গণ্য করতেন এবং তার সমালোচনা করাটাকে পাপ হিসাবে দেখতেন। কিন্তু সম্প্রতি যখন কিছু কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দিল তখন ঐ সকল বুদ্ধিজীবীরা একেবারেই নীরব। বাংলাদেশ কার্যকর কি অকার্যকর রাষ্ট্র তা নিয়ে বেশ বির্তক চলছে এখন। বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার অর্থ আলাদা একটি রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা। যদি কেউ মনে করেন বাংলাদেশ অকার্যকর রাষ্ট্র তিনি এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন এবং কেউ যদি তা মেনে নিতে না চান তিনি তার প্রতিবাদও জানাতে পারেন। কিন্তু বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তখন যখন দেখি, যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে কোনরকম সমালোচনা শুনতেই নারাজ তাঁরা এ ঘটনায় নীরব থাকেন। বাংলাদেশ কার্যকর কি অকার্যকর রাষ্ট্র তা নিয়ে বিতর্কে জড়ানো বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। বাংলাদেশ কার্যকর কি অকার্যকর তার চেয়েও বড় কথা হলো, যাঁরা হঠাৎ করে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র বলছেন সেটা তারা করেছেন একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ এবং সম্প্রসারণবাদ শক্তির মদতে। সে প্রসঙ্গে খুব বেশি আলোচনা করবার সুযোগ এ প্রবন্ধে নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং এই রাষ্ট্রের জনগণ এই প্রবন্ধে মূল আলোচ্য বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যাঁরা বলছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ঘটনা–সেই স্বাধীনতার ব্যাপারটাকে বুঝে দেখা জনগণের স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষার জায়গা থেকে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র কার্যকর না ব্যর্থ সে প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লিখেছেন, রাষ্ট্রটি কার্যকর বা ব্যর্থ কোনোটাই নয়। তিনি লিখছেন, 'বরঞ্চ বলতে হবে যে এই রাষ্ট্রের ভূমিকা শত্রুতার; শত্রুতা করছে সে জনগণের স্বার্থের সাথে। শত্রুতার এই কাজে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ সফল এবং অত্যন্ত দক্ষ।' তিনি লিখছেন, 'জনগণ এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, শাসক শ্রেণীর স্বার্থ দেখবার জন্য নয়, জনগণের স্বার্থ দেখভাল করবার জন্যই। আসলে শাসকশ্রেণী বলতে আলাদা একটি শ্রেণী থাকবে একথাটাই জনগণ ভাবে নি। তারা যুদ্ধ করেছে একাত্তরে, সংগ্রাম করেছে তারও অনেক আগে থেকে, রাষ্ট্রকে ছোট বড় কিম্বা কেবল স্বাধীন করবার জন্য নয়, রাষ্ট্রকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্যই। সে মুক্তি আসেই নি, উল্টো মানুষের ভাগ্যে জুটেছে লাঞ্ছনা ও অপমান।'[১] সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে বলছেন এ রাষ্ট্রটা জনগণের নয়, বরং জনগণকে শোষণ করবার জন্য। তিনি আরো বলছেন, নিম্নবর্গের যে মানুষগুলো স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিল সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্য এই স্বাধীনতা পাল্টাতে পারেনি। সিরাজুল ইসলাম স্পষ্ট করেই বলছেন, স্বাধীনতা তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, স্বাধীনতার পরও রাষ্ট্রটি রয়েছে শোষকদের নিয়ন্ত্রণেই। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, শিক্ষিত সুবিধাভোগী মানুষ প্রতিবছর মহা সমারোহে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস পালন করছে। স্বাধীনতাকে এ জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন বলে প্রচার করছে। পাশাপাশি স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য প্রত্যেক সরকারও কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে আজ তিন দশকের বেশি। তিনদশকে বাংলাদেশে বহুকিছু ঘটেছে। বহু উন্নয়ন ধরা পড়েছে আমাদের রাজনীতিবিদ-অর্থনীতিবিদদের চোখে। স্বাধীনতা নিয়ে গর্ব করছে বহু মানুষ, স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালিত হচ্ছে, সারম্বরে প্রতিবছর পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস পালনে সরকার যেমন তৎপর, তেমনি তৎপর প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমরা বড় বড় অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা সহ সকল শহরগুলোতে। বড় বড় সরকারী-বেসরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেয়ে গেছে ঢাকা শহর। গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক বাণিজ্যিক বিপণী, খাবারের দোকান। কোটি টাকা দামের গাড়ি কিনছে বাংলাদেশের মানুষ, লাখ টাকা দামের পোষাক পরিধান করছে, হাজার টাকার বেশি ব্যয় করছে একজন একবেলা খেতে। বাংলাদেশের বহু ছেলেমেয়ে পৈত্রিক খরচে বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা করছে। নিশ্চয় তা বাংলাদেশের উন্নয়ন বৈকি! সকল সরকারও বলে থাকে আমরা ক্রমশ উন্নতির দিতে যাচ্ছি। চারদিকেই শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়ন। সরকারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি কিম্বা সমর্থন পাওয়া যায় ঠিকাদার, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, আমলা, শিল্পী-সাহিত্যিক, বিভিন্ন পদধারী ব্যক্তিবর্গ, দুরদর্শন-বিজ্ঞাপনী সংস্থা-উন্নয়ন সংস্থা-পত্র-পত্রিকার মালিক ও কর্তাদের কাছ থেকে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি তাদের জন্য নানা সুযোগ উপস্থিত করেছে। কোটি টাকার গাড়ি চড়ে তাই তারা রাষ্ট্রের, স্বাধীনতার জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সন্দেহ নেই, ত্রিশ বছরের আগের তুলনায় বাংলাদেশের এখনকার জৌলুস ও বৈচিত্র্য অনেকগুণ বেড়েছে। বাংলাদেশের বহু মানুষ যারা আগে বিলাসী জীবন যাপনের সাথে পরিচিত ছিল না, তারা এখন বিলাসী জীবন যাপন করতে পারছে; পাশ্চাত্যের সাথে বিলাসীতার প্রতিযোগিতায় নামতে পারছে। সেটা উন্নয়ন নয়তো কি? যখন চারদিকে উন্নয়নের এই জোয়ার দেখা যাচ্ছে, তখন স্বাধীনতা নিয়ে কিছু মানুষ গর্ব করবে তাতে আর আশ্চর্য কী! বাংলাদেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকরা আজ উন্নয়নের যে জোয়ার দেখতে পাচ্ছে, সেই একইরকম উন্নয়ন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখতে পেয়েছিলেন তার সময়ের বাংলায়। বঙ্কিমের দেখা উন্নয়নের সাথে তাই একবার আজকের বাংলাদেশকে মিলিয়ে নেয়া যাক।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসায় যখন D"Pe‡Yi mweav‡fvMx wn›`iv ব্রিটিশ শাসনে বাংলার নানা উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন–তখন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার মন্তব্য তুলে ধরেন। বঙ্কিম লিখছেন, 'কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না?..ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গ-মালায় দিগগজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। যে রোগ পূর্ব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তার তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখন্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিতে; এখন

সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল এখন সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, কান্ডেলাব্রা, মারবেল্, আলাবাষ্টার,–কত বলিব?' সামান্য পরেই তিনি লিখছেন, 'এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ি গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে–উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে–যাইবার সময়, হয় জমীদার নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত চষিবার জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস–সপরিবার উপবাস। বল দেখি চসমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরাজ বাহাদুর! বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?'

বঙ্কিম এরপর লিখছেন, 'আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারই দেশ–দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের মঙ্গল নাই।'[2] বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন, যেখানে হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত্তের অবস্থার উন্নতি হয়নি সেখানে তিনি সামান্য কয়েকজনের প্রাচুর্য দেখে জয়ধ্বনি দেবেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পার হয়ে এসে বাংলাদেশ দু-দুবার স্বাধীনতা লাভ করেছে কিন্তু হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের অবস্থার কি কিছু উন্নতি ঘটেছে? যদি না ঘটে থাকে তবে ভদ্রলোকরা স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে কার মঙ্গলের জয়ধ্বনি দিচ্ছে? ঘটা করে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন করেছে কোন সুখ বা তৃপ্তি নিয়ে? বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, যদি হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত্তর পক্ষে কলম না ধরবো তো কিসের এই মনুষ্য জীবন। ব্রিটিশের আমলা বঙ্কিম বাবুও যেখানে জনগণের বিরাট অংশের মঙ্গল না দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, সেখানে আমাদের দেশের শিক্ষিতরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভুক্ত রেখে স্বাধীনতার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

বিজয় দিবসে যখন দেশের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা বাহারী পোষাকে সজ্জিত হয়ে উৎসবে যোগ দিচ্ছে, তখন দেশের সত্তর ভাগ মানুষের পেটে খাবার নেই, পরনে শীতবস্ত্র নেই। বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসে পরিশ্রম না করলে ঐদিনও তাদের খাবার জুটবে না। যখন অন্যরা উৎসব করছে তখন স্বাধীন দেশের অর্ধ উলঙ্গ মানুষরা এসে হাত পাতছে ভিক্ষার জন্য। যখন বাহারী পোষাকে উৎসবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সৌখিন মানুষ, তখন শীতবস্ত্রের অভাবে কাঁপছে উত্তরবঙ্গ সহ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এবং শীতে মারা পড়ছে কেউ কেউ। ষাট ভাগ মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছে আর সাত ভাগ মানুষ পালন করছে বিজয় উৎসব। বিজয় উৎসবে যখন আমরা ভদ্রলোকদের শোভাযাত্রা দেখতে পাই, তখন উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ, শীতকম্পিত কোটি মানুষের একটি মিছিলও আমরা দেখতে পাই। সে মিছিল থেকে জীর্ণ শীর্ণ যুবক-বালক-বৃদ্ধ ও শিশুরা প্রশ্ন করে, 'তোমরা স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন করছো, বাহবাহ! আমাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, একখন্ড জমি নেই, রোগে চিকিৎসা নেই–তোমাদের এই বিজয় কিসের বিজয়? তোমাদের এ স্বাধীনতা কার স্বাধীনতা? আমাদের ভারবাহী পশু বানিয়ে রেখে তোমরা স্বাধীনতার আনন্দে মেতেছো?' ভদ্র লোকরা অবশ্য ঐ শোভাযাত্রার মানুষগুলোকে খুব কমই পাত্তা দেয়। নাক সিটকায় ওদের দেখে এবং মনে করে ওটাই ওদের ভাগ্যলিপি।

যারা কোটি কোটি মানুষকে মানবেতর অবস্থায় রেখে বিজয়ের অহংকারে মেতেছে, তারা ধরে নিয়েছে দরিদ্ররা দরিদ্র থাকবে এবং সে নিজে যে ধনী হয়েছে এটাই বিধান। ভারতের বর্ণাশ্রম সমাজে যেমন শুদ্রকে মনে করা হতো সেটা তার জন্মফল। সেটাই তার নিয়তি। স্বাধীন বাংলাদেশের দরিদ্রদেরকেও শিক্ষিতরা এবং শাসকরা সেই চোখেই দেখছে। মনে করছে দারিদ্র তাদের নিয়তি। তাদের কাজ দারিদ্র মেনে নিয়ে ধনীদের সেবা করে যাওয়া। প্লেটো যেমন মনে করতেন রাষ্ট্রে ক্রীতদাস থাকতে হবে অভিজাতদের সেবা করার জন্য। বাংলাদেশের ভদ্রলোকরাও তাই মনে করে। দরিদ্র মানুষরা যখন সবকিছু হারিয়ে শহরে এসে রিক্সা চালাচ্ছে–বাঁচার যখন আর পথ নেই তার–সরকার সেই সকল রিকশাওয়ালার বাঁচার কোনো পথ তৈরি না করেই বড়লোকদের সুবিধার জন্য রিকশা তুলে দিচ্ছে। লোকসানের কথা বলে বন্ধ করে দিচ্ছে মিল কারখানা। শ্রমিকদের যে তারপর কী ঘটবে সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজনটুকু বোধ করছে না তারা। রাষ্ট্রের যেন কোনো দায় নেই এই মানুষগুলোর প্রতি, তারা যেন রাষ্ট্রের নাগরিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকে দেখি গোঁসাই শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে নন্দিনীকে বলছে, ওদের কম বাঁচলেও চলে। গোঁসাইর সংলাপ, 'সব দিক ভেবে যে পরিমান বাঁচা দরকার, আমাদের সর্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে।' পরের সংলাপে গোঁসই বলছে, 'পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ, তাই বুঝে তার ভাগবাটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেক বেশি পরিমানে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি।'[3] গোঁসাইর সেই সংলাপ আজ ভদ্রলোকদের কণ্ঠেই শোনা যাচ্ছে। দরিদ্ররা বাঁচলো কি মরলো তাতে কী আসে যায়, কিন্তু তাদের শহরের রাস্তা-ঘাট চক চক করা চাই। বন্যায় ভেসে যাক সকল গ্রাম তবুও ভদ্রলোকদের শহরগুলোকে ঝকঝকে তকতকে রাখা চাই। ভদ্রলোকরা তাই কোটি কোটি মানুষকে অভুক্ত রেখে নিজেরা কোটি টাকার গাড়ি কিনতে কিম্বা লক্ষ টাকার পোষাক পরিধান করতে লজ্জা পায় না। যারা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছেন তারাও অনেকে আছেন এই দলে। যখন তাদের সহযোগী মুক্তিযোদ্ধারা না খেয়ে আছে তখন নিজের আখের তারা ভালই গুছিয়ে নিয়েছেন। কোথায় তাদের কোটি টাকার উৎস, কার ঘামে? শোষক তবে কে?

স্বাধীনতার আগে আমরা পাকিস্তানীদের বলতাম শোষক–এখন নব্য শোষক কারা? জনগণের সম্পত্তি এখন লুটপাট হয়ে কোথায় যাচ্ছে? পাকিস্তানী শোষকদের জায়গায় কারা আবির্ভূত হয়েছে এখন? শোষক হিসাবে পাকিস্তানী শোষক আর আজকের শোষকের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তীব্র শোষণের মধ্যেও কি দরিদ্র মানুষের মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন বেঁচে থাকতে পারে কিংবা বেঁচে আছে? ইয়াসমিন ধর্ষণের শিকার হলো বাংলাদেশের পুলিশদের দ্বারা। এমন ঘটনা একটি নয়, অনেক। পাকিস্তানীদের দ্বারা ধর্ষিত হওয়া আর বাংলাদেশীদের দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? স্বাধীন দেশ কি ধর্ষণ ঠেকাতে পেরেছে? স্বাধীন দেশে আমরা দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ধর্ষণের শততম রজনী পালন করছে–সরকার আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। কোন্ স্বাধীন দেশ তবে দেখলাম আমরা? স্বাধীন দেশে কাদের 'মুক্তির গান' শুনছি আমরা? মিথ্যা মুক্তির গানে বঙ্কিম কণ্ঠ মেলাননি। কোন বিবেকবান মানুষ কণ্ঠ মেলাতে পারে না। বাইরের হৈচৈ বড় কথা নয়, ভিতরে কী ঘটছে সেটাই বড় কথা। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিজয় বিজয় করে চিৎকার করলেই বিজয় আসে না–স্বাধীনতার নামে জয়ধ্বনি দিলেই স্বাধীনতা অর্জন হয় না।

ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগষ্ট। বাংলাদেশ তার একদিন আগে পাকিস্তানের একটি অংশ হিসাবে স্বাধীন দেশ

হিসাবে চিহ্নিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিন কলকাতা শহরে স্বাধীনতা উৎসব চলছিলো। নানারকম উৎসব পালনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলো কংগ্রেস দল। সেদিনই নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুরীর পরিচালনায় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে **দুঃখীর ইমান** নাটকটি দেখানো হয়। সেই নাটক মঞ্চায়নের আগে শিশির কুমার একটি বক্তব্য রেখেছিলেন। শিশির কুমার জানতেন প্রেক্ষাগৃহের বাইরে তখন জনতা উল্লাস করছে। তা জেনেও তিনি বলেছিলেন, 'এ স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। অস্ত্র এখনো মাউন্টব্যাটেনের হাতে।' শিশির কুমারের এই বক্তৃতায় দর্শক সেদিন উল্লাস প্রকাশ না করলেও আপত্তি করেনি। ঠিক পরের বছর স্বাধীনতা দিবসে তিনি বলেন, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বলবেন 'এ স্বাধীনতা ভুয়া স্বাধীনতা'। মধ্যবিত্ত দশর্কদের ততোদিন স্বাধীনতা সম্পর্কে পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। সেজন্য পরবর্তী স্বাধীনতা দিবসে তিনি নাটক মঞ্চায়নের আগে বলেন, 'আজ দুঃখের দিন স্বাধীনতা দিবস নয়। স্বাধীনতা কোথায়? দেশ বিভক্ত হয়েছে, এক বাঙালী, এক পাঞ্জাবী আজ দুই রাষ্ট্রে।' তিনি আরো বলেন, 'সাধারণ লোকের খাদ্যের কথা বিচার করুন। দেশে আজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা।রেশনের চালে পাথর খেয়ে খেয়ে রেশনের এলাকার লোকেরা পেটের রোগে মরণাপন্ন। ফলে দেশের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। মানুষ যদি মানুষের মত খেতে এবং বাস করতে না পারে কিসের স্বাধীনতা?[4] শিশির কুমার ছিলেন তৎকালীন বাংলা মঞ্চের সম্রাট। তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে পাকাপাকি যোগ দিয়েছিলেন পেশাদারী মঞ্চে। তাঁর আগে এরকম ভদ্র পরিবারের উচ্চশিক্ষিত কোনো যুবক পেশাদারী মঞ্চে আসেনি। কারণ ঐ জগৎটা সম্পর্কে অনেক বদনাম ছিল। তাঁর পূর্ববর্তী নাট্য ব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্রকেও তিনি অভিনয় প্রতিভায় ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ভীষণ পড়ুয়া ছিলেন তিনি। বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেক্সপীয়র, শেলী ও বার্নার্ড শর প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দুর্বলতা। রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে তিনি গভীরভাবে অধ্যায়ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণত পেশাদারী মঞ্চে নাটক দেখতে যেতেন না। কিন্তু তিনিও কয়েকবার শিশির কুমার ভাদুরীর নাটক দেখতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের নাটক তাঁকে মঞ্চায়ন করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিশির ভাদুরী, ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে সে একই প্রশ্ন তোলে ভারতের মার্কসবাদীরা। তাদের ধ্বনি ছিল 'লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'। লক্ষ মানুষকে অভুক্ত রেখে যে স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়–একথা সাম্যবাদীরা জোরেসোরেই বলেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতার সমালোচনা আরম্ভ করে সাম্যবাদীরা। সাম্যবাদীরা কি ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিরুদ্ধে ছিল? মোটেই তা নয়। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তারাও আন্দোলন করেছে, লড়াই করেছে। স্বাধীনতা লাভের প্রশ্নে সাধারণ মানুষের ভাগ্যকে পাল্টাবার কথাই তারা বলেছিলো। তাদের কাছে স্বাধীনতা ছিল শব্দ মাত্র নয়, কোটি কোটি নিম্নবর্গের মানুষের মুক্তি। কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য তারা লড়াই করেছিলো সে স্বাধীনতা তারা লাভ করেনি বলেই তাদের এই সমালোচনা। গান্ধী, নেহরু, জিন্নাহ বা কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এক পাতানো স্বাধীনতা, আপোষমূলক স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের পদলেহন করেছিলো। স্বাধীন দেশের কর্তৃত্ব নিম্নবর্গের মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে যাক গান্ধীবাদীরা তা চায়নি। দেশের শ্রমিক-কৃষকরা যাতে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে না পারে, যাতে দেশের সর্বময় ক্ষমতা ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তার জন্য গান্ধীবাদীরা ব্রিটিশ শাসকদের সাথে নানা ধরনের আপোষ করেছিল। নিম্নবর্গের মানুষের সংগ্রাম যখন তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল তখনই অসহযোগের কথা বলে নিম্নবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে। টেবিলে বসে ব্রিটিশদের সাথে স্বার্থের ভাগাভাগি করে স্বাধীনতা লাভ করলো মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস। জনগণের, শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হলো। শিশির ভাদুরীর মতো বিবেকবান মানুষ ও মার্কসবাদীরা এই স্বাধীনতা মেনে নিতে পারলো না, স্বাধীনতার সমালোচনায় মুখর হলো। সাধারণ জনগণও একসময় ধ্বনি তুললো, 'লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'। শিশির ভাদুরী জনগণের সেই চিন্তার কিম্বা তাদেরই ভাগ্যের অংশীদার ছিলেন।

শিশির কুমার মার্কসবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদারনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা। সেই তিনিও মানুষের দুঃখে স্বাধীনতা সম্পর্কে বারবার প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দেখেও স্বাধীনতার মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছে। কেন তারা স্বাধীনতার মাহাত্ম্য প্রচার করেছে? কারণ স্বাধীন দেশ তাদের কয়েকজনের ভাগ্য পাল্টে দিয়েছে। নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছে তাদের জন্য। দামী গাড়ি, দামী বাড়ি, সহায় সম্পদ সবই পেয়েছে তারা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর কী দেখা গেল? স্বাধীন দেশে কিছু লোক মন্ত্রীত্ব পেয়ে, নানা ধরনের কর্তৃত্ব পেয়ে, কিছু লোক বীর উত্তম, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক খেতাব পেয়ে বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠলো। মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্যের কথা তারা ভুলে গেল। সুবিধাভোগীরা সুযোগ-সুবিধা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা থেকে সরে দাঁড়ালো। দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাদের ভাগ্য পাল্টেছে এটুকুই তাদের জন্য যথেষ্ট। নিজেদের ভাগ্য পাল্টেছে বলেই তারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতে শুরু করলো। তখনও বহু মানুষ আশ্রয়হীন, বহু মানুষ না খেয়ে আছে, বহু মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে–সেটা তারা দেখতে চাইল না বা দেখতে পেল না। স্বাধীন দেশে বহু নিরাপরাধ লোক কারাবরণ করলো, বহু নাগরিককে নির্বিচারে হত্যা করা হলো কিন্তু কিছু লোক তা নিয়ে মাথা ঘামালো না। স্বাধীন দেশের উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত মানুষরা তাদের বিচলিত করলো না। নিজেদের ভাগ্য পাল্টেছে তাতেই তারা খুশী। বাকিদের কী হলো না হলো তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না। মুষ্টিমেয় লোকের সুযোগ-সুবিধা পাওয়াটাকেই তারা ধরে নিল তাদের স্বাধীনতা। নিজেরা তারা গাড়ি-বাড়ি সম্পত্তির মালিক হয়েছে সেটাই তাদের প্রিয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতা তাদের উচ্চবিত্ত হবার সুযোগ দিয়েছে বলেই স্বাধীনতা তাদের কাছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

কিছু কিছু লোক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো নিজেদের ভাগ্য পাল্টাবার জন্য, জনগণের মুক্তি ঘটাবার জন্য নয়। সেই জন্য নিজেদের সুবিধাটুকু নিয়েই তারা বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠলো। মূল যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালো। কিছু কিছু লোক তো যুদ্ধের মাঠ থেকে বহু দূরে বিচরণ করেও, পাকবাহিনীর সেবা করেও স্বাধীন দেশে নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হিসাবে প্রমাণ করেছিলো। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি সেজে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা লুটতে থাকলো তারা। নয় মাস ঢাকায় থেকে পাকবাহিনীর সেবা করেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বুদ্ধিজীবী হিসাবে আবির্ভূত হলো কেউ কেউ। একজন তো জাতীয় অধ্যাপকও হলেন। মুক্তিযুদ্ধ তাদের কাছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ঘটনা তো বটেই। পাশাপাশি ভিন্ন ঘটনাও ঘটলোও। স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃবৃন্দের নির্লজ্জ লুটপাট, জনগণের ওপর রাষ্ট্রের দমন ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করে বহু মুক্তিযোদ্ধা, বহু দেশপ্রেমিক নাগরিক ঐ স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি। বাহাত্তর-তিয়াত্তর সালেই বহু লেখনিতে, মঞ্চায়িত বহু নাটকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ভীষণভাবে সমালোচিত হচ্ছিলো। বহুজন জনগণের মুক্তির জন্য আবার অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলো। বহু মানুষ, বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন তরুণদের একটি অংশ জনগণের মুক্তির কথা ভেবে নতুন করে আর একটি মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিলো। সিরাজ সিকদার তেমনি এক যুদ্ধে অংশ নিতে গিয়ে শাসকদের হাতে প্রাণ দিলেন। বিপ্লবীদের সেই সকল যুদ্ধের পথটা ভুল হতে পারে কিন্তু যুদ্ধের কারণটা ছিলো জনগণ, জনগণের ভাগ্য পাল্টানো। সিরাজ সিকদার ষোলই ডিসেম্বরকে মনে করতেন 'ইন্দিরার ঢাকা দখলের দিবস, বিজয় দিবস নয়'।

যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরপরই সেই স্বাধীনতার সমালোচক হয়ে উঠেছিলো তারা কি সবাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলো? মোটেই তা নয়। তারা ছিলো সমাজ বিজ্ঞান সচেতন কিম্বা শিশির ভাদুরীর মতোই বিবেকবান মানুষ। তাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিলো দেশের সকল মানুষের মুক্তি, যা ছিলো মুক্তিযদ্ধের মূল চেতনা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা থেকে সরে গিয়ে সরকারগুলো জনগণের ওপর নির্মম শোষণ চালাতে শুরু করে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ পরিণত হয় নব্য দেশীয় শাসকদের শোষণে। মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্ব

স্বাধীন দেশের ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চেহারা পাল্টে ফেলে, জননেতা থেকে পরিণত হয় রাক্ষসে। গণ-মানুষের রাজনীতির সাথে এই রাক্ষসদের নতুন করে বিরোধ শুরু হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একপক্ষ 'স্বাধীনতা' 'বিজয় দিবস' নিয়ে বিরাট বিরাট বুলি দিতে থাকে যত্রতত্র, আর অপর পক্ষের কাছে তা প্রহসন হয়ে দেখা দেয়। স্বাধীন দেশে আজ এই বিরোধ চরমে পৌঁছে গেছে। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন যে মতাদর্শগত বা রাজনীতিগত ঐসকল বিরোধ ছিলো না তা নয়, ঐ সকল বিরোধ নিয়েই সকলকে একত্রে পথ চলতে হয়েছিলো। এই দুই পক্ষই মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিকজান্তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছিলো। সেটাই ইতিহাসের বাস্তবতা। ইতিহাসের নিজস্ব বিধান ও গতির কারণেই বহু সময় দুই শত্রুকে এক হয়ে লড়তে হয়। সেখানে এক পক্ষের লড়াইটা হয় দীর্ঘ, অপর পক্ষের লড়াইটা হয় সংক্ষিপ্ত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সুযোগ সন্ধানীরা তাদের সংক্ষিপ্ত লড়াই শেষ করে এখন শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বাকিরা এখনও তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে জনগণের মুক্তির জন্য। এই দুই পক্ষ কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে না। কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ মুক্তিযুদ্ধকে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কোন্ চোখে দেখছে?

বহু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পী-সাহিত্যিকরা বলে থাকেন, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা নিয়ে গর্ব করতে ভুলে গেছে; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাদের মধ্যে বেঁচে নেই। বহু জনের রচনায় বারবার এ কথ বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে জনগণের মধ্যে, এমনকি খোদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই আবেগ আর নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কেন ঘটলো তার বিশ্লেষণ আমরা তাদের কাছ থেকে পাই না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কেন জনগণের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেল সে প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে তারা বলে থাকেন, 'বাঙালী সবকিছু দ্রুত ভুলে যায়'। সত্যি কি বাঙালী মাত্রেই সবকিছু দ্রুত ভুলে যায়, নাকি ঘটনাবলীই বহু কিছু থেকে তার আবেগকে দ্রুত সরিয়ে আনে? যতো দোষ নন্দ ঘোষ বাঙালী জনগণের, নাকি শাসকচক্রের এবং তাদের পদলেহিদের? স্বাধীনতার প্রশ্নে সেই দিকটা নিয়েই আমরা এখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখবো।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখবো, যে বাঙালীরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো এই বাঙালিরাই খুব আবেগ নিয়ে পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা এনেছিলো, মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলো। সেখানেও তাদের সেই উন্মাদনা খুব শীঘ্রই স্তিমিত হয়ে পড়েছিলো। একদিন যে বাঙালী মুসলমানরা বিপুল উৎসাহে পাকিস্তান এনেছিলো শীঘ্রই আবার তারা সেই পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই চলে গিয়েছিলো। মুসলিম লীগ বর্জন করেছিলো। শুধু নেতারা নয়, জনগণও। পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করেছিলো তারা কেন আবার সেই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চলে গেলো, সেই ঘটনাবলীকে বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা দেখবো তার সাথে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর কোনো মিল আছে কিনা। সেক্ষেত্রে জনগণ কেন নিজেই তার নিজের গর্বিত সংগ্রামের বিরুদ্ধে চলে যায় সেটাই এখানে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন সে-সব জাতীয় নেতাদের অনেকেই পাকিস্তানের দাবীতেও সংগ্রাম করেছিলেন। যাঁরা তৎকালে মুসলীম লীগেরই সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি সংগ্রাম করেছিলো বাংলার মুসলমানরাই। মুসলিম লীগের জন্ম ঢাকা শহরেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে দুজন জাতীয় নেতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের একজন মওলানা ভাসানী, অন্যজন শেখ মুজিব। মওলানা ভাসানী চুয়ান্ন সাল থেকেই পূর্ব বাংলাকে আলাদা করার কথা বলছিলেন আর শেখ মুজিব একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তীর নেতা। মুক্তিযুদ্ধের মাত্র তেইশ বছর আগে দুজন নেতাই ছিলেন ঘোরতর পাকিস্তানের সমর্থক। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক লিখছেন, বঙ্গবন্ধু একজন ভালো মুসলমান, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মুসলিম লীগের একজন অনুগত সদস্য ও পাকিস্তান সৃষ্টির ধারণার সমর্থক ছিলেন এবং এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে অংশগ্রহণও করেছিলেন। তিনি আরো লিখছেন, জিন্নাহ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, যুক্তিতে দক্ষ এবং নিবেদিতপ্রাণ জননেতা, যিনি খুঁটিনাটি বিবেচনা করে সে উদ্দেশ্যের পক্ষে কাজ করেছেন এবং তাকে প্রায় সফল পরিণতিতে নিয়ে গেছেন। সেই সফল পরিণতিতে নেয়ার পেছনে বাঙালী মুসলমানদের ছিলো বিশাল ভূমিকা। কোনো সন্দেহ নেই যে, উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভারতীয় জাতির পরিচয়ে আত্মবিলুপ্ত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এই জনতাই একদিন পাকিস্তানী জাতি সৃষ্টির উন্মাদনার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলো।[৫] বাঙালী মুসলমানের জাতীয়তাবোধ সেদিন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিলো। বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেছিলো কোনো কারণ ছাড়া নয়। যথেষ্ট যুক্তি ছিলো তাদের এর পেছনে। ইতিহাস সে কথাই বলে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দেশবাসীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়নি, দেশবাসীর বেশিরভাগই তা স্বেচ্ছায় উৎসাহ সহকারেই মেনে নিয়েছিলো। বাংলাদেশের মানুষ হয়ে গেল পাকিস্তানী, আর অল্প দিনের জন্য হলেও অধিকাংশের জন্যই পরিচয়টা ছিলো গৌরবের ব্যাপার। জঙ্গী আবেগেরও।[৬] যদিও সে আবেগটা বেশি দিন থাকলো না।

পূর্ববঙ্গবাসী বাঙালীরা যেমন পাকিস্তানের মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণায় উনিশশো সাতচল্লিশ সালে নিজেদের জাতিসত্তা ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছিলো তেমনি খুব শীঘ্রই তারা টের পেল মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন তাদের কোনো কাজে আসছে না। পাকিস্তানী শাসনের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হতে সময় লাগলো না। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো নতুন শাসকদের বিরুদ্ধে। ধর্মের চেয়ে ভাষায় ব্যাপারটা বড় হয়ে দেখা দিলো শোষিত মধ্যবিত্তের চেতনায়। সেখানেও ছিলো আবেগ। সাধারণ বাঙালী, শ্রমজীবী বাঙালীর মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা পাকিস্তান রাষ্ট্র নিয়ে গৌরব করার ব্যাপারটা নিস্তেজ হয়ে পড়লো পাকিস্তানী শাসকচক্রের চরম শোষণে। যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তারা পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন করেছিলো সেই মুসলিম লীগ ক্ষমতায় বসার পর যেভাবে দুর্নীতি ও দুঃশাসন চালিয়েছিলো তাতে জনগণের, বিশেষ করে পূর্ববাংলার জনগণের স্বপ্ন অচিরেই ভেঙে গিয়েছিলো। ব্রিটিশদের শাসন, হিন্দু জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করে তারা যে পাকিস্তান বানিয়েছিলো, সে পাকিস্তান তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে তো পারেইনি, উপরন্তু তাদের উপর পূর্বের চেয়ে আরো বেশি নিপীড়ন চাপিয়ে দিয়েছিলো। বহুজনই তখন মনে করতে শুরু করেছিলো এর চেয়ে ব্রিটিশ শাসনই ভালো ছিলো। স্বভাবতই পাকিস্তান নিয়ে গৌরব করার কিম্বা পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তাদের আর কোনো উৎসাহ ছিলো না।

আবেগ বস্তুটা কখনই চিরস্থায়ী হয় না, বাংলাদেশেও হয়নি। স্বাধীনতার পর ঠিক পূর্ব পাকিস্তানেরই পুনরাবৃত্তি ঘটলো বাংলাদেশে। পাকিস্তান যখন জন্ম নেয় তখন শাসকবর্গের শাসন জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি দেখে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে বহুজন যেমন মনে করেছিলো ব্রিটিশরাই ভালো ছিলো, বাংলাদেশের জন্মের পর ঠিক তাই ঘটলো। শাসকবর্গের শোষণে বহুজনই মনে করতে শুরু করে পূর্বের রাষ্ট্রেই তারা ভালো ছিলো।[৮] দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অভাব-অনটন এবং দারিদ্র স্বাধীনতার প্রতি সাধারণ মানুষকে বিরূপ করে তুলেছিলো যৌক্তিক কারণেই। দীর্ঘ সংগ্রাম তারা কেন করেছিলো? নতুন দেশে তারা খেয়ে পরে স্বচ্ছল থাকবে সেইজন্য। স্বাধীন দেশে তারা পেল মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারী এবং দুর্নীতিপরায়ণতা। দুর্ভিক্ষ, মন্দা, খ্যাদ্যাভাবের অর্থই ছিলো সমাজের কিছু কিছু শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত মুনাফা।[৯] স্বাধীনতাত্তোর কালে চোরাচালান মজুতদারী ছিলো টাকা বানানোর একটি ক্ষেত্র এবং দুর্ভিক্ষ ছিলো কেটিপতিদের উত্থানের জন্য স্বর্ণ সময়। দুর্ভিক্ষের সময় ঢাকা শহরের বিলাসী জাঁকজমক পূর্বের যে-কোনো সময়ের চাইতে বেশি ছিলো।[১০] যারা এমনি সময়কে প্রত্যক্ষ করেছে স্বাধীনতা নিয়ে তাদের গর্ব করার কোনো কারণ থাকে না, যা সাতচল্লিশের পর আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। যে লক্ষ্য নিয়ে মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে সেটা যখন তার কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতাও তখন তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। স্বাধীনতা তাকে শোষণ থেকে

মুক্তি তো দেয়ইনি বরং তার ওপর নিষ্পেষণ বহুগুণ বাড়িয়েছে। সেজন্য এদেশের শোষিতরা যেমন পাকিস্তান নিয়ে গর্ব করতে পারেনি, তেমনি বাংলাদেশে নিয়ে গর্ব করাও তাদের জন্য সম্ভব ছিলো না। স্বাধীনতার পরপরই লুণ্ঠিত বিধ্বস্ত বাংলাদেশের চেহারা দেখে কিছু কিছু লোক মনে করেছিলো এর চেয়ে পাকিস্তানই ভালো ছিলো। এবং আরও কিছু লোক নতুন করে পুনরায় মনে মনে পাকিস্তানপন্থী বনে গিয়েছিলো। সেটাই ইতিহাসের বাস্তবতা।

যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলো তারা যেন আমার এ লেখায় উৎফুল্ল বোধ না করে। ভাবতে চেষ্টা না করে লেখাটি তাদের পক্ষে। এ প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তারা যেন প্রমাণ করতে চেষ্টা না করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ বা মুক্তিযুদ্ধ ভুল ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য এই প্রবন্ধ নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সর্বাংশে সঠিক ছিলো। যখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সত্তরের নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী হলো তখন তাদেরকে ক্ষমতা না দেয়া এবং ঢাকায় পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার জনগণের ওপর নৃশংস আক্রমণ–এরপর বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ছাড়া আর কি দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিলো? জনগণকে সামরিক জান্তার বর্বরতার হাতে নিশ্চুপ নিধন হতে দেয়া যায় না বলেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয়েছিলো। স্বাধীন দেশে কারা প্রভুত্ব করবে, দেশ স্বাধীন হলে তা পরবর্তীতে কোনো সম্প্রসারণবাদের বাজারে পরিণত হবে কিনা তা বিবেচনা করার সময় সেদিন ছিলো না। সেই মুহূর্তে যে কেউ যে-কোনো যুক্তিতেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে থাকুক ভুল করেছে। যারা পাকবাহিনীকে সামান্যতম সমর্থন করেছে অন্যায় করেছে এবং যারা পাকবাহিনীর হত্যা-ধর্ষণ-লুটপাটকে ইন্ধন যুগিয়েছে ও সহযোগিতা করেছে তারা ঘৃণ্য; জঘণ্য অপরাধী। যারা স্বাধীনতার বিরোধী ছিলো তাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, যখন নিরীহ মানুষকে নির্দ্বিধায় হত্যা করা হচ্ছিলো, সাধারণ জনগণের ভোটে বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও শেখ মুজিবকে ক্ষমতা প্রদান করা হলো না–তখন পূর্ব বাংলার জনগণের কী করা দরকার ছিলো? মুখ বুজে হত্যা-ধর্ষণ-লুটপাট সহ সকল অন্যায় মেনে নেয়া? নাকি যুদ্ধ করা স্বাধীনতার জন্য?

বাংলাদেশের সকল নাগরিক সহ স্বাধীনতা বিরোধীদের বুঝতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং মুক্তিযুদ্ধের সমালোচনা করা এক কথা নয়। যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাদের অবশ্যই স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া বা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্তের মধ্যে সামান্যতম ভুল নেই। ভুল ছিলো তার রণকৌশলে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতাদর্শ ও চিন্তার মধ্যেও নানা ধরনের ভুল ছিলো, ভুল বুঝাবুঝিও ছিলো। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া বাংলাদেশের মানুষের জন্য অহংকারে বিষয়–কারণ সকল বাংলাদেশী ঐক্যবদ্ধ ভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো। শত্রুর বিরুদ্ধে যে জাতির সর্ববৃহৎ অংশ এক হতে পেরেছিলো সেটা গৌরবের যুদ্ধ। দুঃখের ব্যাপার হলো এই যে, সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকশ্রেণী সেই যুদ্ধকে সঠিক পথে আগাতে দেয়নি। কিছু ক্ষমতালোভী ক্ষমতার লোভে মাঝপথে যুদ্ধকে থামিয়ে দিয়েছে, সাজানো বিজয় অর্জন করেছে। মুক্তিযুদ্ধকে মাঝপথে থামিয়ে দেবার ফলেই সে তার পূর্ণ গৌরবের যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারেনি।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এই যুদ্ধের পক্ষে ছিলো এবং মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। শাসকশ্রেণী ও ভারতীয় সরকার কোনোভাবেই চাইছিলো না মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাক। হেমঙ্গ বিশ্বাস দেখাচ্ছেন যে, ভারত সরকার এই যুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছিলো নিজস্বার্থে। ভারত সরকার ছিলো ভারতীয় বুর্জোয়াদের সরকার। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকারের ভূমিকা ভারতের সংসদীয় বাম দলগুলোরও সমর্থন লাভ করলো। ভারত সরকারের সশস্ত্রবাহিনীর বাংলাদেশের মুক্তিদাতা রূপে যুদ্ধে অংশগ্রহণের পেছনে যে একটি ষড়যন্ত্র ছিলো সেটা তারা নজরে আনলো না। বামশক্তি বুঝতেই পারলো না, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাতে একটি জনযুদ্ধে রূপান্তরিত না হয় তারজন্য তড়িঘড়ি করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে মুক্তিযুদ্ধকে অর্ধপথে থামিয়ে দেয়া হলো। লাওস, কম্বোডিয়ার পথে যাতে বাংলাদেশের গণপ্রতিরোধ গতি না নেয় সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক চক্রান্তের হস্তক্ষেপ ভারতের বাম দলগুলো লক্ষ্য করলো না।[১১] বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীও সংগ্রামের পথ পরিহার করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের এই চক্রান্তের সাথে হাত মেলালো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভটা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলাফল হয়ে দাঁড়ালো।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে শাসকশ্রেণীর ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীনতার পর সমস্ত মানুষের মুক্তি আসেনি, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত হয়নি সত্যিকারের গণতন্ত্র পর্যন্ত। স্বাধীনতার পরেও একদলীয় শাসন কায়েম হয়েছে, বারবার সামারিক শাসন জারী হয়েছে, নানা রকম কালাকানুন ঘোষিত রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে একজন ইতিহাসবিদ লিখছেন, এই স্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতা নয়, একই সঙ্গে শোষিতের ওপর শোষকের বিজয়ের স্বীকৃতিও। তিনি আরো লিখছেন, বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী দুই দফায় জয়লাভ করেছে। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে তারা বর্ণহিন্দু ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে জিতেছিলো এবং উনিশশো একাত্তর সালে তারা জিতেছে নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে।[১২] তারপরেও মুক্তিযুদ্ধের যে মাহাত্ম্য প্রচার করা হচ্ছে তা শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই হচ্ছে। বিশেষ করে যে শাসকশ্রেণী মুক্তিযুদ্ধকে নিজেদের ক্ষমতা লাভের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। শ্রমিক-কৃষক তথা নিম্নবর্গের মানুষরাই হচ্ছে জনগণের ব্যাপক অংশ। জনগণের এই ব্যাপক অংশের চেতনাকে যদি রাষ্ট্র ধারণ করতো তাহলে সমাজতন্ত্রের প্রশ্নটিকে সামনে আনা হতো। মুক্তিযুদ্ধের একটি বড় দিক ছিলো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বর্তমানে তা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত। সাধারণ জনগণের, শোষিত মানুষের এই চেতনাকে ধারণ করার কোনো কারণ নেই প্রধানত এই জন্য যে, স্বাধীনতা তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দেয়নি। ব্রিটিশদের শোষণ থেকে পাকিস্তান লাভ আর পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম শোষিতদের জন্য একই ফলাফল বহন করে এনেছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও তারা নিপীড়িত, রাষ্ট্র ও সরকারের আইন দ্বারা নিগৃহীত।

পক্ষান্তরে মধ্যবিত্তরা এই স্বাধীনতা যুদ্ধের পর নানা ধরনের সুবিধা লাভ করেছে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকুরি, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি সর্বাঙ্গনেই। মধ্যবিত্তদের মধ্যে রয়েছে প্রধানত দুটি দল। একদল সুবিধাভোগী ও শাসকশ্রেণীর কাছাকাছি অবস্থান করে, অনেক ক্ষেত্রে তারা শাসকদের অত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। অন্যরা পশ্চাদপদ মধ্যবিত্ত এবং শাসকশ্রেণীর অনুগ্রহপ্রার্থী। বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের সুবিধাভোগী অংশটি মুক্তিযুদ্ধের পর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে রাষ্ট্রীয় জীবনে, শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সুবিধাভোগী এই মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং নিম্নবর্গের বিভিন্ন শোষিতশ্রেণী সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি অবস্থানে রয়েছে। নিম্নবর্গ যেমন শাসকশ্রেণী দ্বারা শোষিত হচ্ছে, মধ্যবিত্তশ্রেণী তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোষিত হলেও শাসকশ্রেণীর শোষণের ভাগ পাচ্ছে। মধ্যবিত্ত এই সুবিধাভোগীদের স্বার্থ আর নিম্নবর্গের শোষিতশ্রেণীর স্বার্থ এক নয়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাই দু পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিটিও ভিন্ন। সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এক ধাপ এগিয়ে গেছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকেও প্রসারিত করেছে কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির প্রশ্নে এই যুদ্ধ কোনো ভূমিকা রাখেনি। পাকিস্তানী শোষক চক্রের দ্বারা শোষণের জায়গাটা শুধু বাঙালী শাসকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তের সুবিধাভোগী অংশ দখল করেছে। মধ্যবিত্তরা যে নিজেদের চেতনে এবং অবচেতনে শাসকশ্রেণীর পক্ষ নিচ্ছে তার কারণ শাসকদের লুণ্ঠনের সেও ভাগীদার।

ফলে বাংলাদেশ নামে একটি দেশ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যারা নিজেদের ভাগ্য পাল্টে নিয়েছে, দিনে দিনে আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে, সেই মানুষদের একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হৈচৈ করবে সেটাই স্বাভাবিক। যেমন পাকিস্তান জন্মের মধ্যে দিয়ে যারা গাড়ি-বাড়ি-ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করেছিলো, তাদের একটি অংশ ধর্মীয় উন্মাদনায় ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির কারণেই পাকিস্তানের ধ্বংস চায়নি। সেই জন্য সাধারণ বাঙালী মুসলমানরা যখন শোষিত হচ্ছিলো, যখন তারা ক্ষুধা অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলো, সুবিধাভোগীরা তখনও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য গৌরব করছিলো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। বাংলাদেশে জন্ম নেয়ায় যারা সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে

স্বাধীনতা তাদের অনেকের কাছেই গৌরবের ব্যাপার। পাকিস্তানের সুবিধাভোগীরা ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করেছিলো, বাংলাদেশের সুবিধাপ্রাপ্তরা বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা তৈরি করেছে, অন্যপক্ষ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্মাদনা তৈরি করেছে জনগণের মধ্যে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে টিকেয়ে রাখার জন্য। সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার কথা তারা কেউ বলছেন না। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিলো জনগণের ভাগ্য পাল্টানো, পকিস্তানের শাসন ও শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করা। স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি মূলমন্ত্র ছিলো সামাজতন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ আসলেও সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ কখনো আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সমাজতন্ত্রের যে প্রশ্নটি ছিলো তা সম্পূর্ণই বাদ দিয়ে রেখেছে ভদ্রলোকও শাসকরা। স্বাধীনতার মূল একটি প্রশ্ন সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে তারা সেটাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে দাবী করছে।

মানুষের মূল লড়াইটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বাঁচার লড়াই। মুক্তির লড়াই। সেটা কখনো ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের চেহারা ধরে আসে, কখনো পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন হিসাবে, কখনো মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে। যুদ্ধটা সেখানে প্রধান নয়, মানুষের মুক্তিটাই প্রধান। মুক্তিযুদ্ধের সার্থকতা সেখানে শুধু যুদ্ধে বিজয়ের ভিতরে নয়, জনগণের সত্যিকারের মুক্তিলাভের মধ্যে। যুদ্ধটা সেখানে উপলক্ষ্য, মুক্তিটাই লক্ষ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিচার হবে সেই প্রেক্ষিত থেকে। যে-মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই সেই মানুষের মুক্তি ঘটেছে কিনা, জনগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত সুখ সমৃদ্ধ জীবন লাভ করেছে কি না। মোদাস্সের হোসেন মধু একজন মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক। যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি পঙ্গু হয়েছেন। স্বাধীনতা লাভের তেইশ বছর পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার তেইশ বছর পরও যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধ গিয়েছিলাম তা পূর্ণ হলো না। বরং উল্টোটা হয়েছে। ভাবতাম স্বাধীন দেশে বঞ্চনা থাকবে না, বৈষম্য থাকবে না। ঘুষ-দুর্নীতি উচ্ছেদ হবে। সবাই চাকরি পাবে। গরিব-দুঃখীরা দু মুঠো ভাত পাবে কিন্তু আজ দেখছি বিপরীত ব্যাপারস্যাপার। আমার কাছে বাংলাদেশ আছে বলে মনে হয় না। আমি এটাকে অন্য দেশ ভাবি বা মনে মনে ধরে নেই, দেশ স্বাধীন হয় নি।'[১৩] শফিউদ্দিন আর একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি যুদ্ধ করে পঙ্গু হন। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়েছিলেন পাকসেনাদের হাত থেকে মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য। দেশবাসীর কাজ-কর্ম, থাকা-খাওয়ার সুযোগ বাড়ানোর জন্য। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখে মনে হয় না এদেশে স্বাধীনতা লাভ করেছে। আমি দেখতে পাই মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার আরও বেড়েছে।' মধুর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে বলেই সে মনে করে দেশ স্বাধীন হয়নি।

শফিক মধুর মতো বহু মুক্তিযোদ্ধাই মনে করছে দেশ স্বাধীন হয়নি। শফিক ও মধু কোনো উচ্চবিত্তের সন্তান নয়। গ্রামের সাধারণ ঘরের ছেলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মধু এবং তার মতো যে-সকল সাধারণ মানুষরা যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে, আহত হয়েছে কিম্বা পঙ্গু অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, স্বাধীনতার ইতিহাসে এমনকি তাদের কথা স্বীকার করাও হয় না। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে-সকল রাজনৈতিক বিরোধ চলছে সেখানে মূল বিতর্ক হচ্ছে কে স্বাধীনতার স্থপতি, কে স্বাধীনতার ঘোষক তাই নিয়ে। সাধারণ জনগণের বিরাট ভূমিকা সেখানে হারিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পরপরই নিম্নবর্গের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে উধাও– দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বড় বড় খেতাব জুটছে উচ্চবর্গেরই কয়েকজনের। নিম্নবর্গের জায়গা হয়নি সেখানে। শুরু থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উচ্চবর্গের আধিপত্য দ্বারা আচ্ছন্ন। উচ্চবর্গরাই তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখেছে। ফলে সে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে শাসকদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা। ভদ্রলোকদের লেখা সে-সব ইতিহাস পাঠ করলে মনে হবে, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে একজন ব্যক্তি, একটি দল এবং কয়েকজন সেক্টর কমান্ডারের দ্বারা। বহুজনই ভুলে যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের চার পঞ্চমাংশ এসেছিলো গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। যাদের সমাজে তেমন কোনো পরিচয় ছিলো না। কিন্তু তারাই লড়েছে সবচেয়ে সাহসের সাথে এবং নিম্নবর্গের মানুষের মুক্তির জন্যই তারা লড়াই করেছিলো।

বহুজন বলে থাকেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছি। অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটেনি। বহু অর্থনীতিবিদ-রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী বলে থাকেন, যখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে তখনই মানুষের দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র দূর হবে। ঠিক আছে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বাদই দিলাম। কিন্তু সত্যিই কি আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছি? স্বাধীনভাবে কথা বলবার, সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা কি সত্যিই এই রাষ্ট্রের আছে? শিশির ভাদুরী পঞ্চাশ সালে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'সাতচল্লিশ সালে যেমন বলছিলাম তেমনি আজও বলছি আমরা আইনতঃ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের প্রজা–স্বাধীন দেশের লোক নই। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং নেহেরু যত বাণীই দিন এবং কংগ্রেস বছরের পর বছর এই দিনে যত অর্থের অপব্যয় করুক–একথা আজ সকলের কাছে দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। সম্প্রতি আর একটি ঘটনায় আমাদের 'স্বাধীনতার রূপ বোঝা গেছে। আমাদের দেশে আমেরিকার লোক এসে যদি অপরাধ করে তাদের নাকি এদেশের আইনে বিচার করা চলবে না। একে কি স্বাধীন দেশের আইন বলে?'[১৪] শিশির ভাদুরীর প্রসঙ্গেই আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রতি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী কোনো মার্কিন সেনা বা অফিসারকে তার কৃত কোনো অপরাধের জন্যই বাংলাদেশ বিচার করতে পারবে না কিংবা বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের দারস্থ হতে পারবে না। এমনকি কোনো মার্কিন সেনা বা কর্মকর্তা যদি অন্য কোনো দেশে অপরাধ করে কিম্বা অপরাধের জন্য সেদেশে শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় তাহলেও বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না কিম্বা তাকে আন্তর্জাতিক আদালতে সোপর্দ করা যাবে না। যার অর্থ দাঁড়ায় মার্কিন সৈন্যরা বাংলাদেশে যা খুশী তাই করতে পারবে এবং অন্য দেশে অপরাধ করে বাংলাদেশকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। বাংলাদেশের সাথে মার্কিনীদের আর একটি চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার এইদেশে মার্কিন স্বার্থবিরোধী কাজে নিয়োজিত বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এবং বাংলাদেশে সকল মার্কিনী স্বার্থরক্ষার জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১৫] এসব চুক্তির পরও বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র মনে করা হয় এবং দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি।

স্বাধীনতার নামে আমরা এখন সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব করছি। ভারত তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সাময়িক শত্রু হিসাবে দেখা দিলেও মূল শত্রু হয়ে দেখা দেয় না। বিশ শতকের গোড়ায় যখন বাংলার মানুষ তার মুক্তির সংগ্রাম শুরু করে তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিলো প্রধান শত্রু। কিন্তু তা খুব জোর পেল না, হিন্দু মুসলিম বিরোধটাই শেষ পর্যন্ত খুব গুরুত্ব পেল স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে। যখন দেশভাগের ধ্বনি তোলে পূর্ব বঙ্গের জনগণ, তখন ব্রিটিশদের চেয়ে বর্ণ হিন্দুরাই হয়ে উঠেছিল তাদের প্রধান শত্রু। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামও শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম বিরোধী সংগ্রামে রূপ নিল এবং ভারত ভাগের মধ্যে দিয়ে তার একটি আপাত সমাধান ঘটলো। ভারত ভাগের পর ব্রিটিশদের আর শত্রু মনে হলো না। পরের বার বাংলাদেশের মানুষের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম ভাইরাই হলো প্রধান শত্রু যাদের সাথে কাধ মিলিয়ে তারা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলো। যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের শত্রু ছিলো। লড়াই শেষে স্বাধীন দেশে তারা বন্ধু হয়ে দেখা দিল। সাম্রাজ্যবাদ কখনোই শত্রু হয়ে দেখা দিল না। সকল লড়াইয়ের পরেই। সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীন দেশের গভীর বন্ধু হলো। বাহান্নতে পূর্ব বাংলা উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে লড়াই করলেও ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তুললো না। পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতের ভাষা ইংরেজীই ছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রু মার্কিনীরা বাংলাদেশের এখন প্রধান পরামর্শদাতা এবং স্বাধীন দেশের নিয়ন্ত্রক। মুক্তিযুদ্ধের যাদুঘরেও তারা অর্থ সাহায্য দিচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের যাদুঘরেও তাদের এখন অবাধ গতি। সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করছে মুক্তিযুদ্ধেরই বহু সপক্ষ শক্তি, সাম্রাজ্যকবাদের তেল-গ্যাস ও অন্যান্য লুণ্ঠনকে তারা নীরবে মেনে নিচ্ছে। গণতন্ত্রের চর্চা বাদ দিয়ে পরিবারতন্ত্র কিম্বা

গোষ্ঠীতন্ত্রের ধ্বজাধারী হয়েছে তারা।

কিন্তু সকল মানুষ মুখ বুজে নেই। বাংলাদেশে আজও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ লড়াই চলছে, সাধারণ মানুষের ভাগ্য পাল্টাবার জন্য লড়ছে বহু সতেজ প্রাণ। ভদ্রলোকরা এদের ভালো চোখে দেখে না, পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমও তাদেরকে খবরে স্থান দেয় না। বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমগুলো এখন ব্যস্ত গাড়িওয়ালা ও গ্ল্যামার সর্বস্ব মানুষগুলোকে নিয়ে, মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষার ইতিহাস নিয়ে তাদের খুব আগ্রহ নেই। বাংলাদেশের বিভিন্ন দূরদর্শন কেন্দ্রগুলো এখন যে-সকল অনুষ্ঠান প্রচার করছে তার মধ্যে অছে শুধু বড় লোকদের জৌলুস আর চমক, নাটকগুলোতে থাকে ধনীর দুলাল-দুলালীদের মানসিক সংকট এবং তাদের আচার আচরণ ও বিলাসীতার চিহ্ন। দর্শকদের সময় কাটে তাতে ধনীদের সাজানো-গোছানো ঘর ও মূল্যবান সব পোষাক-পরিচ্ছদ দেখতে দেখতে। দূরদর্শনের অনষ্ঠানে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ছবিই যেন ফুটে ওঠে। সুখী-সমৃদ্ধ এই বাংলাদেশের ভাগীদার নয় নিম্নবর্গের মানুষ। বাংলাদেশ যখন দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে পরিচিত হয় তখন তার দায়ভার, তার লজ্জা এই নিম্নবর্গের মানুষগুলোকেও বহন করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশ কি দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ আর অভাবের দেশই থেকে যাবে, নাকি তারও ভাগ্য পাল্টাতে পারে? বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময় যে স্বপ্ন দেখেছিলো তা পূর্ণ হবার কি কোনো সুযোগই নেই? নিশ্চয় আছে। সে সপ্ন পুরণ হবে একমাত্র সত্য অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে। কঠিন সত্যের মুখোমুখি যদি আমরা দাঁড়াতে পারি, নিজেদেরকে যদি চিনতে পারি এবং মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের চেতনাগুলোকে পুনঃআবিষ্কার করতে পারি, তাহলে অন্ধকার ঘরে আলো ঢুকবে। বর্তমান প্রবন্ধটি তাই একটি গল্প দিয়ে শেষ করতে চাই।

শিশির ভাদুরী একবার শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাথে দুজন সঙ্গীকে নিয়ে দেখা করতে যান। বরীন্দ্রনাথ সাধারণত সকাল বেলা তার নতুন লেখা বিশেষ শ্রোতাদের পাঠ করে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথ সেবার নিজের লেখা ‘গোড়ায় গলদ’ নাটকটি শিশির সহ অন্যান্য শ্রোতাদের নিজের কণ্ঠে পাঠ করে শোনান। উপস্থিত শ্রোতারা রবীন্দ্রনাথের পাঠ শেষে সাধু সাধু বললেও কিম্বা নাটকটির ভুয়সী প্রশংসা করলেও শিশির কুমার চুপ করে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিশির কুমারের মন্তব্য শুনতে চাইলে শিশির কুমার বিনয়ের সাথে নাটকটির ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিলেন। কবির মুখ তাতে রক্তিম হলো এবং তিনি উষ্মার সাথে শিশিরকে জানালেন, তুমি বলতে চাও গোড়ায় গলদ নাটকটি অপদার্থ হয়েছে। এরপর রবীন্দ্রনাথ এক অদ্ভুত কান্ড করে বসলেন। পুরো নাটকের পান্ডুলিপি সকলের চোখের সামনে ছিঁড়ে ফেলতে থাকলেন। রবীন্দ্রনাথকে বাধা দেবার মতো সাহস বা ব্যক্তিত্ব কারো ছিল না। ছিন্ন অংশগুলো মাটিতে ফেলে রেখে রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। শিশিরদের উদ্দেশ্যে চারুচন্দ্রকে বললেন, ‘চারু দেখ, অতিথিদের যেন অযত্ন না হয়। ওদের আর একদিন থেকে যেতে বল।’ তারপর দ্রুত পায়ে তিনি নীচে নেমে গেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে তখন সকলেই বিরক্তি নিয়ে বক্রভাবে তাকাতে থাকলেন শিশির কুমারের দিকে। শিশির তখন মরমে মরে যাচ্ছিল। চারুচন্দ্র শিশিরকে বললেন, ‘কবি আসলে সমালোচনা একেবারে সহ্য করতে পারেন না। নিজের ভুল-ত্রুটি নিজেই বুঝতে পারেন এক সময়। দেখেন না, নিজের লেখাগুলো কাটাকাটি করেন কতবার। কিন্তু অন্যের মুখ থেকে কিছু শুনতে নারাজ। আর একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্য লাগছে। নিজের হাতের লেখার ওপর তাঁর খুব মায়া, কখনও একটা পাতাও ফেলে দেন না। আজ গোটা পান্ডুলিপিটা ছিঁড়ে ফেললেন।’

পরদিন সকালে এসে শিশিরের ঘুম ভাঙালেন চারুচন্দ্র। শিশিরকে বললেন, ‘তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, গুরুদেব ঠিক নটার সময় আপনার সাথে দেখা করতে চান। রথীর কাছে শুনলাম গুরুদেব কাল সারাররাত জেগে ছিলেন।’ রবীন্দ্রনাথ সেদিন শিশির আর তার দু সঙ্গীকে নিজ বাসগৃহে আমন্ত্রণ জানালেন। কবির পুত্রবধূ প্রতিমা নিজ হাতে খাদ্যদ্রব্য তুলে দিয়ে তাঁদের আপ্যায়ণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ সামান্য পর স্নান সেরে নাস্তার টেবিলে বসলেন। সস্নেহে শিশিরের কাছে জানতে চাইলেন তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি তো। শিশির বললেন, ‘কাল রাত আপনার ঘুম হয়নি শুনলাম।’ কবি হেসে বললেন, ‘লেখক নামে এক অদ্ভুত প্রজাতি আছে। সারা রাত জেগে যদি কিছু লিখতে পারে তাহলে রাত্রি জাগরণের কথা তাদের মনেই পড়ে না। কাল তোমরা আমার নাটকটি পছন্দ করনি। তাই তো আমি জেদ করে রাত জেগে নাটকটি আবার নতুন করে লিখে ফেললাম।’ কবি তারপর তাঁর পাড়ুলিপিটা শিশির কুমারের হাতে দিয়ে বললেন, ‘এই নাও। ওটার আগে ‘গোড়ায় গলদ ছিল, এখন ‘শেষ রক্ষা, হলো।’[16] রবীন্দ্রনাথের শেষ রক্ষা নাটকটি তার রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাথে শিশির এই ঘটনাটি বললাম এ কারণে যে, রবীন্দ্রনাথকে শিশির খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি ধরিয়ে দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি। যারা রবীন্দ্রনাথের ‘গোড়ায় গলদ’ নাটককে বাহবা দিয়েছিলেন তারা আসলে তোষামদকারী কিম্বা তাদের ক্ষমতা নেই ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেয়ার। শিশির নাট্য জগতের খুঁটিনাটি জানতের বলেই নাটকটির ত্রুটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনা গ্রহণ করেছিলেন এবং নাটকটি নতুন করে লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকটির গোড়ায় যে গলদ ছিল তাতো আর মিথ্যা নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাই ঘটে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়ায় গলদ ছিল। তখন তা ভালভাবে ধরা না পড়লেও এখন চিন্তাভাবনা করে শেষ রক্ষা করতে হবে। সেক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী-চিন্তাশীল এবং রাজীতিকদের কাজ মিথ্যা প্রশংসা না করে স্বাধীনতার সমালোচনার জায়গাগুলো খুঁজে বের করা কিম্বা কেউ পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রটিকে অকার্যকর বললে তারও প্রতিবাদ করা। দরকার গণ মানুষের মুক্তির জন্য সত্য অনুসন্ধান করা।

তথ্যসূত্র

১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ‘ওপরে হৈচৈ ভেতরে কি’, *নতুন দিগন্ত*, ৩য় বর্ষ: ১ম সংখ্যা, অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৭৯; ২. দ্রষ্টব্য, ‘বঙ্গদেশের কৃষক’, *বঙ্কিম রচনাবলী*, সাহিত্য সমগ্র, কলকাতা: তুলি-কলম, ১৩৯৩, পৃ. ২৮৮-২৮৯
৩. দ্রষ্টব্য, ‘রক্ত করবী’, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থভবিভাগ, ১৯১০, পৃ. ৩৮১; ৪. সুনীল দত্ত, *নাট্য আন্দোলনের ত্রিশ বছর*, কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৮৭, পৃ. ৫৮-৬০; ৫. আবদুর রাজ্জাক, ‘বাংলাদেশ ঃ জাতির অবস্থা’, মুহাম্মদ জহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতিয়তাবাদ বিতর্ক*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭, পৃ. ৫-৬; ৬. আবদুল হক, ‘দোদুল্যমান জাতীয়তা’, *জাতীয়তাবাদ বির্তক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫; ৭. ঐ, পৃ. ৩৫-৩৬; ৮. ঐ, পৃ. ৩৬; ৯. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ‘বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন’, *জাতীয়তাবাদ বির্তক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১; ১০. আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের কোটিপতি মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক*, পৃ. ৪২; ১১. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ‘ অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা’, *থিয়েটার ফ্রন্ট*, ৭ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৫৫
১২. আহমেদ কামাল, *কালের কল্লোল: বাংলাদেশ ১৯৪৭-২০০০*, ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ২০-২১; ১৩. আতিউর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ৭৩-৭৪; ১৪. সুনীল দত্ত, পূর্বোক্ত; ১৫. আনু মুহাম্মদ, ‘সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মীয় রাজনীতি এবং বাঙালী মুসলমানের ট্রাজিডি’, *নতুন দিগন্ত*, ৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৩১-৩২
১৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ‘নিঃসঙ্গ সম্রাট’, *দেশ*, শারদীয় ১৪১১, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ
Delwar Hossain
Editor
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫